এই শহরের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

কালীকৃষ্ণ গুহ

এই শহরের এক আশ্চর্য চরিত্র— অনন্য এক ব্যক্তিত্ব--- অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। আমাদের এই শুরুর বাক্যটি অন্যরকম হতে পারত না। কারণ তিনি একই সঙ্গে কবি, শিশুসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক, চিত্রকর, চিত্রগ্রাহক এবং সর্বোপরি একজন বিশ্বভ্রামণিক। উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান প্রথম স্তরের— বিশেষত সাহিত্য সৃষ্টিতে, সম্পাদনাকর্মে এবং ভ্রামণিকতায়। তাঁর ভ্রমণগুলি শুধু আনন্দভ্রমণ নয়, জ্ঞানপিপাসুর ভ্রমণ, যা মধ্যবিত্ত এক সাহিত্যিক বাঙালিকে বিশ্বের বহু আশ্চর্য প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে— এমনকী আমাজনের জঙ্গল থেকে সুমেরুবৃত্তের মতো বহু দুর্গম প্রদেশেও। মনে পড়ছে গত শতকের ষাটের দশকের শুরুর দিকে তাঁর কবিতার বই 'বিক্ষত অন্বেষণ' হাতে পেয়ে কীরকম বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকেছি তাঁর দিকে! মনে পড়ছে ওই দশকের পরের দিকে বাংলা ভাষার আশ্চর্যতম পত্রিকাটি তাঁর হাত থেকে সম্পাদিত হয়ে এল— 'কবিতা-পরিচয়'— বাঙালি পাঠকের হাতে। বাংলা ভাষায় বিখ্যাত কিছু কবিতার আলোচনা প্রতি-আলোচনা নিয়ে বহুস্বর এসে পৌঁছল পাঠকের কাছে। কবিতা যে বুঝতেও হয়--- বোঝারও যে বহু দৃষ্টিকোণ আছে— বহু রকম ভাষ্যই যে সম্ভব— এইসব কথা সামনে উঠে এল। সারা শহরের সচেতন কবিতা পাঠক ও কবিসমাজ টানটান হয়ে নিজেদের অবস্থান নিতে লাগলেন এই পত্রিকাটিকে ঘিরে। অমরেন্দ্রর চোখের দিকে তাকানোই প্রায় সম্ভব ছিল না সেদিন। বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মহাজনদের সঙ্গে তাঁর বসবাস। আমরা কবিতাপ্রয়াসীর বিমূঢ়তা নিয়ে তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে, তাঁর পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলির দিকে। তিনি কোনও দিকে না তাকিয়ে রাস্তা পার হয়ে যান। আজ মনে পড়ে। পরবর্তীকালে— বলা যায় সম্প্রতি কাল— তাঁর কাছাকাছি আসার সুযোগ ঘটেছে। সেকথা অবশ্য এখানে আলোচ্য নয়। এখানে বলার প্রধান কথা, তিনি আশি বছর পার হতে যাচ্ছেন। একদিন তিনি বললেন, 'আশি বছর পার হয়ে আসুন। এর আনন্দই আলাদা।' কতখানি জীবননিষ্ঠ হলে একথা বলা যায় ভাবছিলাম। বয়সে সামান্য পিছিয়ে থেকে, শয্যাগত অবস্থান থেকে, যখন মনে হচ্ছিল সামনে অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই— যা-কিছু আছে, যতই সামান্য হোক— পিছনে পড়ে আছে, তখনই

অমরেন্দ্রর এই বার্তা এল। এখন পিছনের একটা আলো এসে হাতে-ধরে-রাখা বইয়ের পাতায় পড়ে, এই সান্ত্বনার মতো আলোটুকু নিয়ে আজকের এই শয্যাগত বাঁচা। বলতেই হবে এই অবস্থায়, আপনি ধন্য, অমরেন্দ্র।

তাঁর বিষয়ে বহু দিক থেকে কথা বলার আছে যা কোনও একজনের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমরা এখানে তাঁর দুটি ছোটদের বই নিয়ে কিছু কথা অত্যন্ত সংক্ষেপে বলতে চাইব। একটি গদ্যে লেখা— 'শাদা ঘোড়া'। একটি পদ্যে লেখা— 'হীরু ডাকাত'। বাংলা ভাষায় শিশুসাহিত্যের বইয়ের ছোট একটি তালিকা বানালেই বই দুটির নাম এসে যাবে। 'হীরু ডাকাত' তো শ্রেষ্ঠ ২০টি বইয়ের তালিকাতেই এসে যাবে মনে হয়।

আগে 'শাদা ঘোড়া'র কথা।

এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। এটি একটি রূপকথা। উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছে, 'আকাশের কোন তারাটা আমার মা? সেই তারাকে।' উৎসর্গপত্রটিও একটি অবশ্যপাঠ্য কবিতা হয়ে উঠল— ক্ষুদ্রতম এই কবিতাটি যেন মাতৃমন্ত্র। গল্পটির কথক একটি বালক, বিজয়, যে একটি শাদা ঘোড়া খুঁজে পায়। রূপকথা শুরু হয় এই সরল সুন্দর ভাষায়: 'আমার একটা শাদা ঘোড়া আছে। গত বছর বর্ষাকালে আমি মাতলাগাঙের ওপারে গিয়েছিলাম, সেখানে মাঠের মধ্যে একটা খাদ থেকে আমি ঘোড়াটাকে নিয়ে আসি। ওর তখন ছ'মাসও হয়নি। ঘোড়াটা খাদের মধ্যে পড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল।' বিজয় তার সারাজীবনের সঙ্গী পেয়ে গেল। রূপকথার বাস্তবতা এইভাবেই এগোয়। এর থেকে অধিক বাস্তবতা রূপকথাকে ধ্বংস করতে পারে। কেমন সেই ঘোড়া? ওকে পাবার দু'বছর পর 'ওর গায়ের রং আরও ধবধবে হয়েছে, আর কপালের ঠিক মাঝখানে বাদামি রেখাটিও আরও সুন্দর হয়েছে। ও কথা বলতে পারে না ঠিকই, কিন্তু আমার সব কথা বুঝতে পারে। আমি ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিলে ও মাথা নিচু করে থাকে, একটুও নড়ে না। ও যখন কপালের দু'পাশের দুই বড় বড় চোখ তুলে আমার দিকে তাকায়, আমি বুঝি ও কী চায়। আমি ওর নাম রেখেছি শাদাপাল।'

এককালের রূপকথায় পশুপাখিরা কথা বলত। এখনকার রূপকথা অতখানি 'রূপকথা' হতে পারবে না। এখানেও ঘোড়া সাড়া দেয় যেভাবে পোষা জীবজন্তু প্রভুর সস্নেহ উক্তিতে সাড়া দেয়।

বিজয় যে জমিদারবাড়িতে রাখালের কাজ করে সেই জমিদার একদিন ঘোড়াটাকে তার মেয়ের জন্য কিনে নিতে চায়। এ তো চাওয়া নয়, ছিনিয়ে নেওয়া। বিজয় তার বন্ধু ও বাল্য সখা ঘোড়াটাকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না কিন্তু যেদিন জমিদার স্বয়ং ঘোড়াটাকে দিয়ে যাবার হুকুম দিলেন, সেদিন ভোররাতে বিজয় ঘোড়াটাকে নিয়ে গ্রাম ছাড়ে। কিন্তু সে বেশি দূর যেতে পারে না, যেহেতু সে তার বন্ধু ঘোড়াটার পিঠে উঠতে চায় না। ফলে পরদিন রাজার লোক এসে খুঁজে বের করে ঘোড়াটাকে বেঁধে নিয়ে যায়। 'তখন ভোরের আবছা ভাব কেটে গিয়ে চারদিক আলোয় চিকচিক করছে, পাখি ডাকছে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক আলোর তির এসে বল্লমের ফলায় ঝিলিক দিচ্ছে।'

রাখাল বালক বিজয়ের মনে কীরকম দুঃখ হয়েছিল তা বোঝানোর জন্য তার

প্রতিজ্ঞা গ্রহণের কথাটা লেখকের ভাষায় শুনে নিতে হবে। 'ভোরবেলাকার আকাশ, তুমি সাক্ষী রইলে, ভোরবেলাকার বাতাস, তুমি সাক্ষী রইলে, বিনা দোষে মল্লিকরাজ আমার শাদাপালকে কেড়ে নিয়েছেন।... আমি যদি আমার মাকে কোনওদিন কষ্ট দিয়ে না থাকি, যদি আমার বাবাকে কোনওদিন কষ্ট দিয়ে না থাকি, তাহলে ভোরবেলাকার আকাশ-বাতাস, তোমরা শোনো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি— রাজাকে আমি পথের ধুলোয় শোয়াব।' একটি বাপ-মা হারানো অপমানিত বালক যেন মন্ত্র উচ্চারণ করল।

কাহিনি এগোতে থাকে। বিজয় তার সঙ্গীকে নিয়ে একটা গ্রামে পৌঁছয়। 'ছুটতে ছুটতে, সূর্য যখন পুব আকাশে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠেছে, তখন একটা গ্রামে পৌঁছলাম। সেই গ্রামের তিনদিক ঘিরে নদী।' সেই গ্রামে মড়কে সব গরু মরে যাচ্ছিল। এক তিনকাল পার হওয়া বুড়ি তাঁর ব্যাখ্যাতীত জ্ঞানদৃষ্টি থেকে বুঝেছিল, এই বালক তাদের বাঁচাতে পারবে। বিজয় পারল। সে গাছের পাতা সংগ্রহ করে ওষুধ বানিয়ে গবাদি পশুর অসুখ সারিয়ে তুলল। কঙ্কালসার মানুষেরাও আবার জমি চাষ করতে শুরু করল, ফসল ফলাল, সুস্থ হয়ে উঠল। মনে রাখা যায়, এককালে পশুসমাজই ছিল মানুষের প্রধান সম্পদ। সেই বেদ, উপনিষদ বা মহাভারতের যুগ থেকে। কিন্তু বিজয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষার কী হবে?

সেই বুড়ি তার অপমান ও প্রতিজ্ঞার কথা শুনে আবারও তাকে পরামর্শ দিল কীভাবে সে অস্ত্র সংগ্রহ করবে। সেই মতো বিজয় সাহস করে, নদী পার হয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে একটা আদিবাসী গ্রামে গিয়ে পৌঁছল, যেখানকার মানুষের তির কখনও ব্যর্থ হয় না। প্রথমে তারা তির ছুঁড়ল বিজয়ের প্রতি যা শাদাপাল নিজের বুক দিয়ে গ্রহণ করে বিজয়কে বাঁচাল। তখন আদিবাসীরা এগিয়ে এসে তাদের দেবতা শাদা ঘোড়াকে দেখে তাকে বরণ করে নিল। তারপর ঘোড়াটাকে বাঁচিয়ে তুলল। তারপর সেই অদিবাসীদের রাজার কাছ থেকে প্রচুর তির-ধনুক পেয়ে সেই বুড়ির গ্রামে ফিরে উপকৃত গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে বিজয় সেই মল্লিকরাজের বাড়িতে পৌঁছে নির্বোধ অহংকারী জমিদারকে লক্ষ করে তির ছুঁড়ল। জমিদার তিরের আঘাত থেকে বাঁচতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বিজয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হল— রাজাকে ধুলোয় শোয়ানোর প্রতিজ্ঞা। তারপর যা হয়, রাজার কন্যার সঙ্গে বিজয়ের বিবাহ আর রাজত্ব লাভ। কাহিনিটা অত্যন্ত মানবিক ও মসৃণ। তবু আসল সম্পদ হল এর ভাষা। কয়েকটা উদ্ধৃতিতেই আশা করি তা পাঠক বুঝেছেন। এই কাহিনির কথক বিজয় নিজে। সে গল্পটা এইভাবে শেষ করে। '... যেদিন কেন জানি না, সকাল থেকেই আমার খুব মন কেমন করে, সেদিন দূর মাঠে গিয়ে বিরাট আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আপন মনে বাঁশি বাজাই।'

এবার 'হীরু ডাকাত'-এর কথা। পদ্যে গল্প বলার দিন বহুদিন আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ছন্দের শক্তি ফিরিয়ে আনলেন অমরেন্দ্র, এই বইতে। ছন্দ-মিল শুধু সংলাপেই না, আখ্যান বর্ণনাতেও।

একসময় বিশেষ করে ইংরেজ শাসন শুরু হবার আগে মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না। যখন পুলিশি ব্যবস্থা বা আইনি বা বিচারব্যবস্থা ছিল না দেশে।

সমাজ শান্তভাবে নিজেকে রক্ষা করত বলেই টিকে থাকত। তবু বলশালী লোকজন দল গঠন করে অন্যের ধনসম্পদ লুঠ করত অবাধে। বাংলার ডাকাতদের নিয়ে সত্যমিথ্যে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। সেই প্রচলিত গল্পের ধারায় এক ব্যতিক্রমী ডাকাতের তিনটি অভিযানের অত্যাশ্চর্য কাহিনি তৈরি করেছেন অমরেন্দ্র, যাকে ঐতিহাসিক কাহিনির মতো বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন তিনি।

আগে হীরুর পরিচয় দেওয়া যাক লেখকের অনবদ্য ভাষায়ঃ

'আমাদের এই গ্রামের নামটি চাঁদের হাট
চাঁদের হাটের হীরু ডাকাত ভয়ঙ্কর
দিনের বেলায় বাঁশি বাজান, বয়স ষাট,
রাতের বেলায় মন্দ লোকের আতঙ্ক।'

প্রথম অভিযানের শেষে এই পরিচয় পাওয়া যায়। হীরু ডাকাত বাঁশি বাজান দিনে, রাতে ডাকাতি করেন মন্দ লোকের বাড়িতে। তখন তাঁর বয়স ষাট। কেন ডাকাতি করেন তিনি?

'ভোরের বেলা ফেরেন যখন জবা বনে
লুটের অন্ন রেখে আসেন দুঃখী লোকের হিম উঠোনে।'

আর

'হীরু কী খান?
ভিক্ষা যা পান।'

হীরুর জীবনে নিজের কোনও চাহিদা নেই। শুধু দুঃখী দরিদ্র মানুষের জন্য তার এইসব অভিযান। হীরুর আরও একটি পরিচয়ের কথা ভুললে চলবে না। সে বাঁশি বাজিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে।

'ঠিক মনে হয় কাঁদছে হীরু, কাঁদছে প্রবল।
ঠিক মনে হয় বাঁশিটি তাঁর চোখেরই জল।'

এখানে বিশুদ্ধ সংগীত সম্পর্কেও লেখকের মন্তব্যটি অমোঘ। বিশুদ্ধ ভারতীয় সংগীত আসলে একা মানুষের গভীর ব্যাখ্যাতীত কান্নারই প্রকাশ। তাই 'বাঁশিটি তাঁর চোখেরই জল'।

হীরু ডাকাত পারতপক্ষে নিষ্ঠুর বা অমানবিক আচরণ করে না। পুলিশের সঙ্গে তার নিরন্তর লুকোচুরি খেলা চলে। সে নানা ছদ্মবেশ নিয়ে পুলিশের হাত থেকে নিজেদের বাঁচায়— নানা সংকেতিক আওয়াজ শুনে (কখনও শিস, কখনও তক্ষকের ডাক, কখনও টিয়ার উড়াল) বুঝতে পারে পুলিশের গতিবিধি। একেবারে মুখোমুখি এসে পড়লে ছদ্মবেশ নিয়ে এমন অভিনয় করে যে দারোগা বিভ্রান্ত হয়।

প্রথম অভিযানে সাধুর ছদ্মবেশী পুলিশের চরকে বাধ্য হয়েই হত্যা করতে হয় আর তার সন্ন্যাসীর পোশাক পরে নিয়ে হীরু নিজেই পুলিশের চর সেজে থাকে আর দলবল নিয়ে দারোগা তার অরণ্যের ডেরায় হাজির হলে তাকে বিভ্রান্ত করে সে দারোগাকে বলেঃ

‘গুলি করুন গুলি করুন, গুলি করুন হুজুর।
দেখুন কেমন বেঁধে রেখেছে, ভয়েই ছিলাম জুজু।
এক গুলিতে উড়িয়ে দেন প্রাণডা
দলের মধ্যে আছে দলের পান্ডা।’

এইভাবে নানা কথাবার্তা চালাতে চালাতে হীরু দারোগাকে এক বস্তা সোনা ভাগ করে নেবার প্রস্তাব দিতে দারোগা অন্য মানুষ হয়ে যায়। সে তার লোকজনকে অন্য কাজে পাঠিয়ে দেয় আর সোনার ভাগ শুরু করতে চায় যখন হীরু নিজের পরিচয় দিয়ে দারোগাকেই বেঁধে ফেলে। তারপর রসুলপুরের বজরা আক্রমণ করে লুটপাট চালিয়ে ধনীর সম্পদ অধিকার করে। প্রথম অভিযান ঘটে উনিশশো সালে।

আগেই বলেছি, এই গল্পে সবকিছুই ছড়ার ছন্দে বলা— যেমন চরিত্রদের মুখের কথা বা ডায়লগ, তেমন মধ্যবর্তী ঘটনাগুলির বর্ণনা। সবই অবাধ, স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ। যেন একটা ভাষার স্রোতোস্বিনী বয়ে চলেছে— ছন্দের গতিতে, মিলের ধ্বনিমাধুর্য নিয়ে।

দ্বিতীয় অভিযান ঘটে উনিশশো ছ'সালে। ‘এসব যখন ঘটছে তখন উনিশশো ছ'সাল।’ বরের বাবার দাবি মানতে না-পারার জন্য একটি মেয়ের বিয়ে আটকে যাবার খবর পেয়ে হীরু সেখানে হাজির হয়। সেখানে যখন বিয়ের ব্যাপারটা প্রায় সমাধান হয়ে এসেছে তখন দারোগা আসে। হীরু কিছু আগেই সংকেত পেয়ে পুরোহিতের ছদ্মবেশ নেয়। নানা কথায় ভুলিয়ে একটা জঙ্গলের পথে নিয়ে এসে হীরু স্বরূপ ধরে। একা দারোগা হীরুকে পুরোহিত ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল। এখন হীরুর কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে প্রাণরক্ষা করে, কারণ একান্ত বাধ্য না হলে হীরু কারও প্রাণ হরণ করে না। হীরু বলে,

‘কিন্তু তোমায় মারব না আজ, সঙ্গে আমার আছে যে বর-কনে।’

হীরু বর-কনেকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসে।

‘বাংলা বিহার সীমান্তে
একদল লোক প্রত্যহ যায় রাজার জন্য ঘি আনতে।
গোধূলিতে গোয়ালপাড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা
একদল ঘি লুটতে থাকে, অন্যে দেয় পাহারা।’

এইভাবে তৃতীয় বা শেষ অভিযানের গল্প শুরু হয়। সেই সময় উনিশশো নয় সালে, ‘সবাই কাঁপে হীরু ডাকাতের নামে/ যদিও ইংরেজ বাহাদুর রটিয়েছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার গ্রামে/ শীঘ্র নাকি হীরুর হবে ফাঁসি।’ কিন্তু একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রশ্ন ওঠে, ‘তাহলে কেন আজ এখানে কাল সেখানে হীরুর শিস আর বাঁশি?’ হীরুর শিস আর বাঁশি সবাই চিনতে পারে কিন্তু তার সবটুকু সংকেত শুধু তার নিজের লোকেরাই অনুসরণ করতে পারে, আর সেই মতো কাজ করে।

এই গল্পে একজন লোককে দেখতে পাওয়া যায় হীরুর অরণ্যের পথে। যে বলে ‘সাধ করে কেউ আসে কি এই ভীষণ গহন বনে!/ সরকারি এক মস্ত বিজ্ঞাপনে/

বলেছে, কেউ হীরুর খবর দিলে—/ কিন্তু বাবা/ আর পারি না!' পুরস্কারের লোভে হীরুকে খুঁজে ফেরা এই দরিদ্র হাভাতে লোকটাকে শেষ পর্যন্ত হীরু আশ্রয় দেয় একথা জেনেও যে, 'থানায় খবর দিলেই পাঁচশো। জ্যান্ত মরা ধরে দিলে আরও বেশি ইনাম—/ জানো তো ভাই, পঁচিশ হাজার হীরুর মাথার দাম!' এই দুঃস্থ লোকটা প্রথমে ছদ্মবেশী হীরুকে চিনতে পারে না। হীরু তাকে বলে, 'কী আশ্চর্য, আমিও ওই লোভে/ দুদিন ধরে ঘুরছি বনে বনে।/ একটা কথা শোনেন—/ একই সঙ্গে দুজন করি চেষ্টা/ দুইয়ের কষ্টে মিলবে ঠিকই কেষ্টা।' কিন্তু এই অভিযানের শেষে, গয়লাদের কাছ থেকে লুট করা জিনিস রাজার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে আনার পর হীরু তার জীবন পালটে ফেলতে চায়। ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে, দল ভেঙে দিয়ে সে পৃথিবীটা ঘুরে দেখতে চায় (যেমন এই গল্পের লেখক স্বয়ং করেছেন!) বলে, 'ছোট্ট একটা কাজ রয়েছে, সেটা সেরেই বেরিয়ে পড়ব দূরে। পৃথিবীটা দেখব ঘুরে ঘুরে। বিশেষ করে বিন্ধ্য-হিমাচল—।' কিন্তু ওই দুঃস্থ মুমূর্ষু লোকটা হীরুর আশ্রয় ছাড়তে চায় না। সমস্ত ট্র্যাজেডির মহান নায়কদের মতো হীরুও ভুল ক'রে লোকটাকে— তার কান্নাকাটিতে মুগ্ধ হয়ে— সঙ্গে রাখে। ঘোড়ায় উঠে তার পিছনে তার ঘাতককে বসিয়ে নেয়। এবার নতুন জীবনের পথে তার যাত্রা। মনে তার মুক্তির আনন্দ। বস্তুত একজন মহৎ মানুষ সে। বয়সও সত্তরের কাছে। জীবন তো পালটাবেই। কিন্তু যাত্রা শুরুর পরেই যা ঘটে:

হীরু : শুনতে পাচ্ছ? আহ্ কী পাখির কূজন!
ভোরবেলাকার বনের মজাই এই!
লোকটি : ঠাকুরের আজ ভাসান যেন, আহারে আজ সঙ্গে গজা নেই!
গয়লা বউ ভেজে দিয়েছে— এই নাও গো, সরভাজা আর পুরি
বলেই সোজা হীরুর পিঠে বসিয়ে দিল ছুরি।

হীরুর মহত্ত্বের কারণে প্রাণ দেওয়ার মধ্য দিয়ে গল্প শেষ হয়।
এই বইয়েরও উৎসর্গ পত্রটি আগে পড়ে নিতে হবে।
আকাশের একটা তারা
আমার বাবা,
সেই তারাকে—
যাঁর কাছে আমার লেখার হাতেখড়ি
যাঁর কাছে আমার শেখার শেষ নেই
—এই উৎসর্গটিও একটি পিতৃস্তব হিসেবে নেওয়া যায়।

আগে যে কথা বলেছি তা আরও একবার বলি। 'হীরু ডাকাত' একটি মহৎ সৃষ্টি। এটি 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময়ই আমরা বিপুল আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। বিপুল আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন, যতদূর জানি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষের মতো ছন্দসিদ্ধ মহাজন কবিরাও। পড়েছেন, আজও পড়েন, বাংলা কবিতার সংবেদনশীল পাঠক। হীরু বাংলা সাহিত্যের এক ট্র্যাজেডির নায়ক। ট্র্যাজেডির নায়কদের মৃত্যু নেই।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যতটা অঞ্চল জুড়ে বেঁচে আছেন ততটা অঞ্চল জুড়ে কম

মানুষই বাঁচে। ভূগোলের অঞ্চল আর মেধা ও সৃষ্টিশীলতার সুবিস্তৃত অঞ্চল সঙ্গে নিয়ে তিনি আশি বছর পার হয়ে জানাচ্ছেন, ‘আশি পার হবার আনন্দই আলাদা।’ ভাবা যায় না! তাঁর কাজ চলতেই থাকবে জানি। আমরা এই জীবনে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য দর্শক মাত্র। তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই।

লেখক পরিচিতি

জন্ম ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর (এখন রাজবাড়ি) জেলায়। ১৯৫৭ সাল থেকে কলকাতায়। কবিতা ও প্রবন্ধলেখক। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক আধিকারিকের কাজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত। ‘আরেক রকম’ পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন কিছুকাল। আপাতত গৃহবন্দির জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁর জীবনে বলার মতো সাফল্য না থাকলেও শুধু বেঁচে থাকার আনন্দ ও গৌরব কিছু কম নেই। এই রকমই মনে করেন তিনি।